ঈদের করোনাকাল ও সেকাল

’ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ’…….গানটি এই প্রথমবারের মতোন আমাদের মধ্যে মন খারাপের আবেশ তৈরী করছে। যাপিত জীবনে এরচেয়ে নিরানন্দের ঈদ আমাদের জীবনে আসেনি। এবারের এই পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। এই মহামারি আমাদের সকল আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। অথচ ঈদের রঙ এমন ছিলোনা।

ঈদ মানে, খুশী ঈদ মানে আনন্দ। এই উৎসব এখন শুধু মুসলমান ধর্মের অনুসারীদের নয় এখন এই উৎসব সার্বজনীন। হাজার হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই উৎসব সাম্যের বারতা নিয়ে আসছে। এই আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। ধনী-গরিব-যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু, কিশোর-কিশোরী সবাই অদৃশ্য এক অনুভূতিতে আলোড়িত হন। এ অনুভূতির রূপভেদ থাকতে পারে। মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ঈদ সন্দেহাতীতভাবে সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

দুই ঈদের মধ্যে ঈদুল ফিতরেই ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে বেশি। দীর্ঘ একটি মাস রোজা রাখার পর পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ ওঠে। চাঁদ দেখেই মনের গহীনে রিন্ রিন্ করে বেজে ওঠে ঈদের খুশির ঘণ্টাধ্বনি। ঈদের মূল আনন্দ ও চেতনা সকল কালে এক ও অভিন্ন কিন্তু এবারে পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। করোনাকালের আগে শাওয়ালের চাঁদ দেখা হলেই পরদিন ভোরে উঠেই শুরু হয়ে যেতো ঈদের উৎসব । সকাল সকাল গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে বাড়ীর সকলের সাথে দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া; দু’রাকাত নামাজ পড়া এবং খুৎবা শোনা; গরিব মিসকিনদের দান খয়রাত করা, আত্নীয় স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানো, নিজের বাড়ীতে সকলকে আপ্যায়ন, দলবেধে ঘোরা, আড্ডা দেয়ার মধ্য দিয়েই কেটে যেতো ঈদের দিন।

করোনাকালের আগের ঈদের সবচেয়ে বড় দিক ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতা।সেই ঈদে নিভাজ নিপাট আনন্দ নিয়ে প্রাণ খুলে একে অন্যের সঙ্গে মিশেছে মানুষ। কিন্তু করোনা এসে সব শেষ করে দিয়েছে। আমাদের সকল সামাজিক, পারিবারিক বাঁধন একবোরে শিথিল, ঢিলে করে দিয়েছে। আমরা আজ সবছাড়া, বিচ্ছিন্ন, তাই এবারের ঈদ আমাদের জন্য বড্ড বিষাদের, বড্ড কষ্টের। গত ঈদেও বাড়ীর ছোটরা ছিলো সবচে বেশি উচ্ছ্বল। নতুন জামাকাপড়, সালামি, ঘোরার আনন্দে সারা বাড়ী চনমনিয়ে রাখতো। এই আনন্দ শুধু ছোটরাই করতো- তা না আমরাও আমাদের ছোটবেলায় এটা করতাম। তবে আমাদের সময়ে আজকের মতো এতো রেডিমেড গার্মেন্টস ছিল

না। অধিকাংশ সময়ে বাজার থেকে কাপড় কেনা হতো তারপর দর্জির দোকানে মাপজোখ দিয়ে কী দারুণ অপেক্ষা!

আর মনে মনে প্রার্থনা-আমার কাপড় যেন সবচেয়ে সুন্দর হয়। মনে মনে শঙ্কা-যদি যথাসময়ে সেলাই শেষ না হয়। মাঝে মাঝে কাপড়ের দোকানে তাগাদা দেবার জন্য মাকে জ্বালাতাম। এই মহামারির আগে প্রত্যেক ঈদ শুরু হতো সেই ভোর বেলায়। ভোরে উঠেই হইহুল্লুড়। গোসল সেরে সাজবার পালা। নতুন কাপড়, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা আর গায়ে সুগন্ধী আতর। তারপর দল বেঁধে ঈদগায় যাত্রা। নামাজ শেষে কবর জিয়ারত, পাড়া মহল্লার সবার সাথে কোলাকুলি করে বাসায় ফিরে আসা। ফিরে এসে বড়দের পায়ে ধরে সালাম, ছোটদের সালাম নেয়া আর সালামি দেওয়ার রেওয়াজ বরাবরের মতো। সব ঘরেই রকমারি খাবার তৈরি। চারদিকে খাবারের মিষ্টি সুবাস, হাসিখুশি আর আনন্দ। আমাদের নামাজ পড়ে আসার আগেই পরিবারের নারী সদস্যরা গোছল করে নতুন কাপড় পরে বসে থাকতো। আমরা ফিরে আসার পরে সবাই একসাথে খেতে বসতাম। মিষ্টি, দই, লাচ্ছা সেমাই, খিচুড়ী, মুরগী, গরুর গোস্ত আর পোলাও-ছিলো ঈদের খাবার। করোনাকালের আগে দেখতাম মা, আমার স্ত্রী, বোনেরা বাসার আসে পাশের ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দিতো।

এবারের ঈদে এসবের কিছুই হবেনা। প্রতিবার সবচে উপভোগ করতাম ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়া। ঈদের সময় রাস্তায়, ট্রেনে ও বাসে দেখা যেতো প্রচন্ড ভিড়। সবাই নাড়ীর টানে বাড়ী যেতে চাই। কেউ বাড়ীতে, কেউ শ্বশুরবাড়ি কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। ফেরিঘাটের অসহনীয় জাম শেষে নদীটা পার হলেই সব কষ্ট শেষ। এবারে একদম বন্দী জীবন। যারা বের হচ্ছেন সেই রাস্তায় বের হওয়া মানুষগুলো ভয়ে, শংকায় আতংকিত। সবাইকে একটা অদৃশ্য ভয় তাড়া করে ফিরছে। আমরাও একটা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। ঈদের কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ করছেনা। ছোটবোনটা তার বাচ্চাদের নিয়ে তার শহরে একা, বাচ্চাদের বাবা তার কর্মস্থলে, মা বাড়ীতে একদম ছোটবোনটাকে নিয়ে মন খারাপ করে আছে আর আমরা চারজন ঢাকাতে। এবারে ছোটভায়ের নতুন বউকে নিয়ে প্রথম ঈদ করার কথা ছিলো আমাদের। করোনা সেটা করতে দিলোনা।

এবারের ঈদ আমাদের যাপিত জীবনে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। এই প্রথম সকালে হুল্লোড় করে ঘুম থেকে উঠা হবেনা, দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া হবেনা, জামাতে নামাজ পড়া হবেনা, নামাজ শেষে কোলাকুলি হবেনা, বাড়ীতে বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া হবেনা, হবেনা আনন্দের সাথে সেই বাড়ী যাওয়া। তবে নিশ্চয় মাস্কপরা, গ্লোভস পরা ঈদই আমাদের জীবনের শেষ ঈদ নয়।

একদিন আমরা এই পরাক্রমশালী করোনাকে পরাজিত করবো। ঈদের উৎসবী আমেজটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো এবং গলা ছেড়ে, মুক্তির আনন্দে গেয়ে উঠবো….. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ……………..

লেখক: উন্নয়নকর্মী ও প্রশিক্ষক

ভয় – এসআই মেহেদী

ভয়ে আজ থরথরিয়ে হাতটি কাঁপছে! কী বোর্ডে হাত ঠিকমতো পড়ছে না। মাথাটাও কেমন যেন দপ দপ করছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খুব খুব বেশি ভয় হচ্ছে! অজানা আতঙ্কে হৃদয়ের কম্পন গতি বেড়েই চলেছে। একটি পরাজয়ের ভয় যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে আমার মানসপটে। কেন এতো ভয় হচ্ছে আমার?

৭১ এর রনাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ কিশোর ছেলেটিতো সেদিন ভয়ে কাঁদেনি! জীবনের শেষগুলিটিও তো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি? তের বছরের কিশোরী মেয়েটি সেইদিন দশজন পাকিস্তানী নরপশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে এতটুকু ভয় পায়নি? সেই একই দিনে, রাজারবাগ বেতারের কনস্টেবল তো আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দিতে ভয় পায়নি! এমনকি আমার পূর্ব পুরুষরা সাজোয়া ট্যাংকের উপর গুলি ছুড়তেও একাত্তরে ভয় পায়নি। তাহলে আজ আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি? আমি তো তাদেরই উত্তরসূরী। তাহলে কি আমি ভীতু! সত্যিই কি আমি ভীতু?

আমিও তো চালিয়েছি সিন্দাবাদের সেই পঙ্খীরাজ। দুর্দান্ত দাপটের সাথে টিপু সুলতানের মতো, আস্তাবলের সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে ছুটেছি সারদার পুলিশ ট্রেনিঙয়ের মাঠে। এক লাফে চুড়ায় উঠেছি; নয় ফুট উচ্চতার সমান সীমানা প্রাচীরের। রশি বেয়ে উঠেছি বাইশ ফুট। গ্রীষ্মের কাটফাটা দাবদাহের গরমে পুড়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে প্রতিদিন দৌড়েছি দশ কিলোমিটার পথ।

একআঙ্গুলে বহন করে চলেছি চার কেজি ওজনের হাতিয়ার। আমার আঙ্গুলের ইশারায় গগনবিদারী শব্দে গর্জে উঠেছে বিশ্বসেরা সব আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু আমি তখন একটুও ভয় পাইনি।প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে দেখেছি

নতুন নতুন কবর! যারা কয়দিন আগে আমাদের মতো করে দৌড়াতো এই কংক্রিটের রাস্তা ধরে। দেখেছি সারদাহ এর মাঠে হঠাৎ পাশের বন্ধুটি কংক্রিটের উপর পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে।

আর আমরা তাকে ফেলে দৌড়ে চলেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কতো জন ভেঙ্গেছে হাত, পা এবং কোমর। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে মাঠ ছেড়েছে অ্যাম্বুলেন্স। তখনতো কোন ভয় পায়নি আমি। মৃত্যু পুরীতে কাটিয়েছি একটি বছর। প্রতিদিন আশে পাশে ঘুরেছে আজরাইল।

একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে পবিত্র সংবিধান, পতাকা ও পবিত্র কোরআনে উপর হাত রেখে শপথ করছি দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তাহলে কেন? কেন সেই আমি আজ ভয় পাবো?

আমার ভয় হচ্ছে। বড্ড ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, হাজারো আশরাফুল শেখদের কথা ভেবে। নড়াইলের আশরাফুল শেখ। বয়স আর কতোই বা হবে!দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়েটি এবার অনার্স শেষ করেছে; আর ছোট মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে।

আশরাফুল শেখ রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ শরীরে মাদুরের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে। তার পা যেদিন চলে না; বাড়ির চুলাটাও সেইদিন জ্বলেনা। আশরাফুল শেখের শরীরটা বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত একবেলা বিশ্রাম তার কপালে জোটেনি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। একটি মাত্র কুড়ে ঘর ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নাই। মেয়ে দুইটি পড়াশুনায় খুব ভালো।

আশরাফুল শেখ ক্ষুধা পেটে অসুস্থ শরীরে মাদুরের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মনের জোরে ধীরপায়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। ভাবে বড় মেয়েটা চাকরী পেলে তার আর কস্ট থাকবে না। আশরাফ শেখ শেষ কবে দুপুরের খাবার খেয়েছে তার মনে পড়ে না। কখনো একটা বিস্কুট সাথে কয়েক গ্লাস পানি দিয়ে পেটটা ভরেছে।তবে ইদানীং সে মনে করে তার চিকিৎসা করানোটা খুব বেশী দরকার।

কিন্তু ভাত যেখানে স্বপ্ন; চিকিৎসা সেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি! ছোট মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। তার একটা জামা কেনার দরকার। আশরাফ শেখ প্রতিদিন অল্প অল্প করে জমিয়ে তিনশ টাকার মতো করতে পেরেছে।

বড় মেয়েটার এমবিএ ভর্তীর তারিখ দিয়েছে। লাগবে তিনহাজার টাকা। এই সব ভাবতে ভাবতে আশরাফ শেখ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোন ভাবেই আশরাফ শেখের জ্ঞান ফেরেনা। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

আশরাফ শেখের মেয়েরা স্থানীয়দের কিছু সহায়তা এবং সুদি মহাজনের কাছ থেকে ধার করে চব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে গত ১১/৫/২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতালে ভর্তি করায়। টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা সে পায়নি।

এরই মধ্যে আশরাফ শেখের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় আশরাফ শেখের করোনা পজিটিভ আসে। অভিমানী আশরাফ শেখ ২০ মে ২০২০ তারিখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে আপন গন্তব্যে পাড়ি জমান।

কিন্তু আশরাফ শেখ মরেও যেন মুক্তি পেলোনা। পেলোনা প্রিয় ভূমি ও প্রিয় মানুষের বিদায়। যেহেতু আশরাফ শেখ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো, তাই তাকে কবর দেওয়ার জন্য কেউ জমি দেয়নি। কেউ খুড়তে চাইনি তার কবর। আশরাফ শেখের অসহায় মেয়ে আর স্ত্রীর বুকফাটা কান্নায় গলেনি কারোর হৃদয়।

এদিকে হাসপাতাল থেকে লাশ নেওয়ায় জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে কতৃপক্ষ। কি করবে আশরাফ শেখের মেয়ে আর স্ত্রী? তাদের তো নিজের কোন জমি নাই। আবার লাশ দাফনের মতো কোন পুরুষ মানুষ ও নাই। তারা অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে হাসপাতালের সামনে।

আল্লাহ মানুষকে কেন এতো কঠিন পরীক্ষায় নেন? মানুষ কেন এতো বেশী অসহায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জোরাজুরীতে আশরাফ শেখের মেয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা লাশ পুলিশ কে দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

আশরাফ শেখের মেয়ে একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা তার বাবাকে চিকিৎসা করাতে পারলো না; মরার পরে নিজেরা দাফন কাজও করতে পারবে না। তার প্রিয় বাবার লাশটাও বাড়িতে নিতে পারবে না।

আশরাফ শেখের মেয়ের বুক ফাটা চিৎকারে হাসপাতালের আশপাশে এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠে। বারবার বাড়িতে ফোন করে কোন সাড়া না পেয়ে

আশরাফ শেখের মেয়ে কান্না থামিয়ে বলে, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন।

আমরা লাশ গ্রামে নিতে পারবো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অফিসার ইনচার্জ মিরপুর মডেল থানা লাশ দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব দেখে শুনে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। ইদানীং খুব তাই ভয় হচ্ছে আমার!

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশজনের করোনা পজিটিভ মিরপুর থানায়। করোনা উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় আরো দশজন। তাই ভয় হয় মিরপুর থানার আমরা সবাই যখন করোনা পজিটিভ হয়ে যাবো তখন কি ঘটবে? আশরাফ শেখদের লাশ কি তখন রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এজন্যই কি তের বছরের কিশোরীটা সেদিন তার শরীরের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের উদ্দাম নাচ নাচতে দিয়েছিল? সে কি জানতো টাকার অভাবে আশরাফ শেখদের চিকিৎসা হবে না? জমি না থাকার কারনে নিজ গ্রামে তার কবর হবে না?

আশরাফ শেখদের কথা শুনে কি কষ্ট পাবেনা সেদিনের সেই কিশোর যোদ্ধাটি। সে যদি জানতো আশরাফ শেখদের জন্য স্বাধীন দেশে এই পরিনতি অপেক্ষা করছে তাহলে কি সে ভয় পেতো না?

সে কি পারতো গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে? নিশ্চয়ই এ কথা জানলে তার হাত কাপতো! বুক চিতিয়ে দাড়াতে পারতো না সেদিন রাজার বাগের পুলিশ বাহিনী!

তাই আজ আমার বুক ভয়ে দূরু দূরু করছে! আমার তো টাকা নাই; চিকিৎসা হবেতো? আমার জমি নাই কবরের জন্য; কেউ জমি দিবে তো? আমার থানায় বিশজন আক্রান্ত!

আমি যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হবেতো? তাই একথা বলতে আজ আমার কোন লজ্জা নাই! ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে।

সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

মেপ্র/এমএফআর

পুরুষের বোবা কান্না-এস আই মেহেদী

পুরুষের বোবা কান্না প্রেক্ষিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন২০০০(সং২০০৩)

আজ মনটা ভিষন খারাপ। প্রিয় সহকর্মী, এস.আই আব্দুল কাদের ভাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি।

তাঁর খুব মুরগীর মাংস খেতে মন চেয়েছে। ওসি স্যার বাসা থেকে মুরগির মাংস রান্না করে এনেছেন কাদের ভাইয়ের জন্য। রাত ৮.০৫ মিনিটে বেতার যন্ত্র বুঝে নিয়ে ডিউটি শুরু করবো। বেতার কং আশরাফ ভাই খুবই মিষ্টভাষী একজন মানুষ। সালাম স্যারঃ আপনার কি স্পেশাল ৭১ ডিউটি স্যার?

আমিঃ হ্যাঁ, আশরাফ ভাই। কোন ম্যাসেজ আছে নাকি?
না স্যার তেমন কিছু না, ঐ কাদের স্যারের জন্য ওসি স্যার মুরগির মাংস দিয়েছে। যদি স্যার কস্ট করে একটু পৌছে দিতেন, স্যার। নিশ্চয় নিশ্চয়।

দেন দেন! স্যার, আর একটা ম্যাসেজ আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আপনার এলাকার কিছু ত্রাণ আছে স্যার, পৌছে দিবেন। আপাতত এইটুকুই স্যার।

ছুটে চললো গাড়ি রাজার বাগের দিকে। অনেকদিন পরে মিরপুরের বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি যতই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ততোই যেন চেনা এই শহরটা বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছে। কোথাও কেউ নেই মাঝে মাঝে দুই একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি।

কখনো কখনো অত্যন্ত উদাসী বাইক আরোহী ছুটে চলেছে আপন গন্তব্যে ফাঁকা রাস্তাধরে। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে মলিন মুখে এক ট্রাফিক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো জনশূন্য এই শহরে বেচারা বড় বেশি একাকিত্বে ভুগছেন। আর প্রিয় জনের প্রিয় স্মৃতি গুলো হাতড়াচ্ছেন।

আমি গাড়ির গ্লাসটা আর একটু নামিয়ে ড্রাইভার কিবরিয়া কে বললাম এই

এটা কি বিজয় স্মরনী? জ্বি স্যার!
বিজয় স্মরনিতে আজ আর কোন সিগনাল নাই। নাই গাড়ির লম্বা লাইন। বার বার উচ্চস্বরে কানফাটানো হর্ন বাজিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সেই দামি দামি গাড়ি থেকে শুনা যাচ্ছেনা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য দেওয়া সেই তির্যক গালি।

সেই ভদ্রলোক গুলো আজ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজ গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু আজো একপায়ে ঠাই দাড়িয়ে আছে, পরিবার পরিজন ফেলে বিজয় স্মরণীর মোড়ের সেই ট্রাফিক কনস্টেবল। এই সব ভাবতে ভাবতেই একসময় আমাদের গাড়ি পৌছে গেলো রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের গেটে। গেটে দ্বায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানালেন এখন কোন কিছু দেওয়া যাবে না।

তাদের অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কিই বা তাদের করার আছে? তারাও তো নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। ঘটনাটি ওসি স্যারকে মোবাইল ফোনে অবহিত করে আবারো রওনা করলাম থানার দিকে।

ফাঁকা রাস্তাদিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ দেখি রাস্তা জ্যাম। গাড়িথেকে নেমে জানতে পারলাম ত্রাণের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছে। মনে পড়ে গেলো মুরব্বিদের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান বানতে হয়।

আমাদেরও ধান বানা শুরু হলো। শতাধিক জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। ভুলে গেলাম সামাজিক দূরত্ব ও করোনার ভয়। আবারো ছুটে চলেছি থানার দিকে এতোক্ষণ বেতার যন্ত্রটার দিকে খেয়াল ছিলোনা। হঠাৎ দেখি বেতার যন্ত্রটি বেজে চলেছে।
ইকো ৭১! স্পেশাল ৭১! লোকেশন কোথায় স্যার? বললাম, থানার কাছাকাছি। একটা নাম্বার লিখেন স্যার। ৯৯৯ এর কল ব্যবস্থা নেন স্যার। প্রাপ্ত নাম্বার টিতে ফোন করে পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। অপর প্রান্তথেকে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কর্কস কন্ঠে জানতে চাইলো আমি কোথায়?

আমি আমার অবস্থান জানিয়ে তার সম্যার কথা জানতে চাই। তিনি বললেন, তার স্বামী তার বাচ্চাদের মারধোর করছে। আমি ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার বাচ্চা মানে কি, বাচ্চা কি আপনার স্বামীর না? বাবাতো বাচ্চাদের একটু শাসন করতেই পারে।

এখানে আমাদের কি করার আছে। তার পরে তিনি যেটা বললেন, তার স্বামী বাসার কোন খরচ দেই না। এইসব বিষয় নিয়ে আজ আমাকে ও আমার

বাচ্চাদেরকে মারধর করেছেন। আমি ভদ্র মহিলাকে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়ায় উনি খুব রেগে গেলেন। উনি আমাকে শুনাইতে ভুললেন না যে, উনার অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার আছেন।

ভদ্র মহিলার কথা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো আমি উনার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রীর দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার। তার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরী করে। গত চারমাস তিনি বেতন পাননি। তারপরেও গত মাসে ৮৫,০০০/= হাজার টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে তিনি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেছেন। তাদের মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে, আর ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী কখনোই বাবা মার সাথে থাকেন নি। তিনি যে গালি গুলো আমাকে শুনালেন তা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশালীন যা লিখা সম্ভব না। তিনি আরো যেটা বললেন তাকে দুই দুই বার মেরে রক্তাক্ত করেছেন। তিনি লোক লজ্জার ভয়ে থানা পুলিশ করেন নি।

তার সাথে আমার আট মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ডের কথার মধ্যে পুরোটা সময় জুড়ে কেঁদেছেন আর বার বার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পারিনি আমি তদন্ত করে তার কোন উপকার করতে। দিয়েছি শুধুই শান্তনা। পারিনি এরকম হাজারো পুরুষের কান্নার কোন জবাব দিতে। তাইতো বলি আইন হবে মানবের কল্যানে কেন তা হবে নির্যাতনের হাতিয়ার?

মেপ্র/এমএফআর

প্রতিটা দিনই হোক মা দিবস…..

আমার কাছে মায়ের জন্য বিশেষ কোন দিন নেই। প্রতিদিনই মা ময়। শুধু আমার না, আমাদের পাঁচ ভাইবোনের কাছে প্রতিদিনই মা দিবস।

আমি তখন কোন ক্লাসে পড়ি মনে নেই। খুব বৃষ্টি পড়ছিলো। সেই ঝুম বৃষ্টির সাথে চোখের পানি মিলিয়ে আমি মায়ের কাছে হাজির। হাতে গোসল করানো বই খাতা। মা আমাকে একঝলক দেখলো তারপরেই নিজেকে মায়ের বুকের মধ্যে দেখলাম আমি। আমাকে সেদিন আমাদের শহরের বিরাট বড় মস্তানের ভাগ্নে রাস্তার পাশের ডোবাতে ফেলে দিয়েছিলো। শোনার সাথে সাথে আমার মা হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেই ভাগ্নের সামনে হাজির। দু তিন ঘা দেবার পর ভাগ্নে আরো উত্তেজিত হয়ে থাকে তার মস্তান মামার ভয় দেখাতে থাকে। আহা!! হঠাৎ আমি আবিস্কার করলাম যে ভয় দেখানোর কান আমার মায়ের হাতে আর মুগ্ধ দর্শক হয়ে মায়ের পিছনে। আমরা হাজির সেই মস্তানের বাড়িতে। সেদিন নতমুখে সেই মস্তানকে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখেছি। আজো চোখ বন্ধ করলে আমার অসীম সাহসী মা আমাকে সাহস দেয়।
আমাদের বাসায় টিভি ছিলোনা। আমরা পাশের কোন এক বাসায় মাঝে মাঝে হানা দিতাম টিভি দেখার জন্য। কার্টুন ছিলো রানার খুব প্রিয়। রানা আমার ছোট ভাই। একদিন কার্টুন দেখার সময় বাসার মালকিন আমাদের মুখের উপর টিভি বন্ধ করে দিলেন। আমাদের মন খুব খারাপ। রানার মন খারাপ একটু বেশি। মালকিন টিভি বন্ধ করার পর আমাদের বলে ছিলেন নিজের বাসায় টিভি দেখতে। আমাদের টিভি নেই কেন এই কষ্টে রানার মন বেশি খারাপ ছিলো। মা শুধু আমাদের সবাইকে বুকের মধ্যে নিয়েছিলেন বলেননি কিছুই। পরদিন সকালে মা নেই। মা আসলো দুপুরের পর। বিরাট বড় একটা বাক্স নিয়ে। সেই বাক্সটা ছিলো আমাদের জন্য জাদুর বাক্স। বাসায় প্রথম ১৭ ইঞ্চি তানিন টিভির আগমন। আমরা ভাই-বোনেরা কোন কোনদিন দিনের বেলায় টিভি চালিয়ে বসে থাকতাম আর মাছি উড়া দেখতাম। আর মা লাগাতার আমাদের মন খারাপের সময়কে সুখের বানিয়ে দিতেন।
আমার বাবা বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেজ শিক্ষক বাবার জীবনে যতোবার সংকট এসেছে আমার মা সেই সংকটে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন। সংকটের মধ্যে মধ্যে দিন কাটানো আমরা কতদিন দেখেছি ম সাহস দিচ্ছেন আব্বুকে। আর আমার বাবা সেই সাহসে সংকট জয় করছেন। তখন থেকেই মা আমাদের কাছে মুশকিলআসান।
আমার বন্ধুর মতোন মা অকালে প্রয়াত প্রেমিকার চিঠি, কার্ড যত্ন করে গুছিয়ে রাখতেন বাবার ড্রয়ারে যেটা আমার জন্য বরাদ্দ ছিলো। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি একজনকে সাহস দিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন সে যেন ভয় না পাই আর ভুল না করে সেই জন্য। আবার জীবিত প্রেমিকাকে ঘরে এনে ছেড়েছেন আমার থেকেও বেশি প্রেম দেখিয়ে।
কাজের কারনে প্রায় সারা দেশেই ঘুরতে হয় আমার। বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের সাথে আমার মেশামিশি। কাউকে কাউকে আমি মা ডাকি আম্মা

ডাকি। এই ডাকাডাকির স্বভাব আমার বেশ পুরাতন। একবার একজন আমার মায়ের কাছে নালিশ করলেন। বিষয় হলো আমার মা কেন এইসব সহ্য করে, কেন আমাকে কিছু বলেনা। কাকতালীয় ভাবে আমি সেদিন আমাদের ড্রয়িং রুমে আর মা তাঁর ঘরে। আমি বোধহয় একটু দ্বিধা জনিত উৎকন্ঠায়। আমি সেদিন যে উত্তর মায়ের মুখে শুনেছিলাম তা আজো কানে তোলা আছে, মনে গেঁথে আছে। মা সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ছেলে যদি কাউকে মা ডাকে আর তাঁর আদর যদি নিতে পারে তবে তো সেটা গর্ব। আপনি একবার ভাবেন আমার ছেলেটা কতজনের ছেলে হয়ে উঠছে। আবার দেখেন অন্যকে মা ডাকার কারনে আমার প্রতি তার ভালোবাস কমেনি বরং বেড়েছে অনেকগুন। আমি জানি -আমি একদিকে আর আমার ছেলের কাছে বাকি দুনিয়া একদিকে। তাই এটা নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই বরং গর্ব আছে।………. মায়ের দেয়া এই উত্তরটা আমাকে সকল মায়ের সন্তান বানিয়েছে।
মায়ের কারনেই আজ এই করনাকালে আমরা অন্য মায়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। এমন বন্ধু, মুশকিলআসান মায়ের জন্য কি শুধু একটা দিন চলে। তাই আমাদের কাছে মায়ের জন্য নির্ধারিত দিন নেই। আমাদের সকল দিনই মা দিবস। কোন মায়ের জন্য একটা দিন নির্ধারন করে দেওয়া তাঁকে কেমন যেন দুরের মানুষ বানিয়ে দেয়। সকল দিনই আপনার জন্য মায়ের মমতায় ভরে উঠুক। যারা মাকে হারিয়েছেন তারা সকল জীবিত মায়ের মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পাক। সকল মায়ের জন্য ভালোবাসা। আমাদের মায়েরা দীর্ঘজীবি হোক। অনেক ভালোবাসা মায়েদের জন্য…..

লেখক : উন্নয়ন কর্মী

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন

“ আপনি নিজেকে লেখক, নিরপেক্ষ পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই। একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত!!

ফ্লাইওভারের কারনে নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঢুকতে দেড় ঘন্টা পরিবর্তে যখন ১৫মিনিট লাগলো তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া এই সরকাররে ধন্যবাদ দিয়া একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন কোন দিন??

অথচ ঘন্টা খানেক জ্যামে পরলে সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা

স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় কোন চিন্তা করি না।
পদ্মা সেতু হইলে সাড়ে চার ঘন্টায় বরিশাল পৌঁছে কি আনন্দে সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিবে কেউ কোনদিন? নাকি ব্রিজে টোল দেয়ার জন্য লাইনে থাকার জন্য সরকারের গুষ্টি উদ্ধার করবে?

আগে ছিলো মরা বিল, যেইখানে ময়লা আবর্জনা ঠাসা ছিলো, সেই হাতির ঝিলে সেলফী খিচতে খিচতে কোন দিন সরকাররে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

ঢাকার শহরে বাস করে ২২ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ পাইয়াও এক ঘন্টার লোডসেডিং সহ্য করতে না পেরে সরকারের পিন্ডি চটকান, তখন কি একবার ভাইবা দেখছেন আগে ঢাকায় ১২ ঘন্টার বেশি কারেন্ট থাকতো না। ২০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এর কারনে আলোক উৎসব হইছিলো। কই দিয়েছেন কি সরকারকে ধন্যবাদ?

মাধ্যমিক পর্যন্ত বই পাইতেছেন আপনারই আত্মীয়স্বজন, তাও জানুয়ারির এক তারিখ তিন কোটি বই পাইতেছে সারা দেশের শিক্ষার্থী, কই একটা স্ট্যাটাস দিয়াও তো সরকাররে ধন্যবাদ দিলেন না।

মেট্রো রেল হওয়ার সাথে সাথে মিরপুর থেকে মতিঝিল যাইবেন আধা ঘন্টায়, তখন কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেইলা সরকাররে ধন্যবাদ দিবেন?? অথচ এখন সেই আপনাদের সময় বাচানোর জন্য রাস্তায় কাজ হইতাছে দেইখা একটু বেশি সময় জ্যামে থাকেন দেইখা সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দিতে কিন্তু ছাড়েন না।

দেশে এত এত উন্নয়ন হইছে সেইটা চোখে পড়ে না? বোমা হামলা নাই, গ্রেনেডে হামলা নাই, শান্তিতে আছি তাই ভালো লাগে না।

যে ভাল কাজ করে তাকে তার কাজের জন্য বাহবা দিতে হয়,তাকে আরো কাজ করার প্রেরনা দিতে হয়, তবেই না আমাদের দেশ টা এগিয়ে যাবে,একজন একা কখনো

দেশটাকে বদলে দিতে পারে না,সবাই মিলে যার যার যায়গা থেকে এগিয়ে এলেই তৈরি সম্ভব আমাদের সোনার বাংলা,,,,

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌঁছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?

আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৭/১৫। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল।

আপনারা বলছে, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি, আমার প্রশ্নঃ তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে? গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে?

টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃষ্টি হয়েছে।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, সিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ।

দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ। অথবা আপনিও আমার বা অন্যের মতো দল করেন, স্বীকার করুন। নিরপেক্ষ দাবি করলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

লেখকঃ এম.এ.এস ইমন সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ